



প্রথমেই আসে শিক্ষার মান ও মনোযোগের বিষয়টি। ঘরের পরিবেশ সব সময় পড়াশোনার উপযোগী নয়। পাশের ঘরে টেলিভিশন চলছে, কেউ কথা বলছে, কেউ আবার রান্নাঘরে ব্যস্ত। এমন পরিস্থিতিতে একটি শিশু কতটা মনোযোগ ধরে রাখতে পারে? অনেক সময় শিক্ষার্থীরা ক্যামেরা বন্ধ রেখে ক্লাসে যুক্ত থাকলেও পাঠে সম্পৃক্ত থাকে না। শিক্ষকও বুঝতে পারেন না কে মনোযোগ দিচ্ছে, আর কে অন্য কাজে ব্যস্ত। ফলে শেখার গভীরতা কমে যায়, পাঠ হয় মুখস্থনির্ভর। দীর্ঘ সময় স্ক্রিনের সামনে বসে থাকা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলছে। চোখে জ্বালা, মাথাব্যথা, ঘাড় ও পিঠে ব্যথা এখন সাধারণ সমস্যা। অনেকের ঘুমের ছন্দ নষ্ট হচ্ছে। বাইরে খেলাধুলার সুযোগ কমে যাওয়ায় শারীরিক বিকাশেও বাধা তৈরি হচ্ছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো একাকিত্ব। বন্ধুদের সঙ্গে সরাসরি দেখা না হওয়ায় শিশুরা ধীরে ধীরে গুটিয়ে যাচ্ছে, আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে।

অনলাইন শিক্ষার আরেকটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো প্রযুক্তিগত বৈষম্য। শহরে অনেক পরিবারে ইন্টারনেট ও একাধিক ডিভাইস থাকলেও গ্রামের চিত্র ভিন্ন। দুর্বল নেটওয়ার্ক, অনিয়মিত বিদ্যুৎ এবং একটি মোবাইল ফোনে একাধিক সন্তানের ক্লাস এই বাস্তবতায় সমান সুযোগ নিশ্চিত করা কঠিন। ফলে যারা প্রযুক্তি সুবিধা পায়, তারা এগিয়ে যাচ্ছে; অন্যরা পিছিয়ে পড়ছে। শিক্ষা যেখানে মৌলিক অধিকার, সেখানে এই বৈষম্য ভবিষ্যতের জন্য অশনিসংকেত।

শিক্ষা কেবল বইয়ের জ্ঞান নয়; এটি সামাজিকতা ও মূল্যবোধ শেখার প্রক্রিয়া। বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, দলগত কাজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা এসবের মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু ভার্সুয়াল ক্লাসে এই স্বাভাবিক পরিবেশ অনুপস্থিত। ক্যামেরার ওপারে থাকা বন্ধুর সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক তৈরি হয় না। সামাজিক দক্ষতা, নেতৃত্বগুণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার অভ্যাসও দুর্বল হয়ে পড়ে।

মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট। অনলাইন পরীক্ষায় নকল বা অন্যের সহায়তা নেওয়ার সুযোগ বেশি থাকে। ফলে শিক্ষার্থীর প্রকৃত মেধা যাচাই করা কঠিন হয়ে যায়। অনেক সময় অভিভাবকের অতিরিক্ত সহযোগিতা শিশুর স্বনির্ভরতা কমিয়ে দেয়। এতে শিক্ষা হয়ে পড়ে নম্বরনির্ভর, দক্ষতানির্ভর নয়।

শিক্ষকদের জন্যও এটি সহজ ছিল না। হঠাৎ করে প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হওয়া অনেকের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে কর্মজীবী অভিভাবকদের সন্তানদের পাশে বসে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে হয়েছে। এতে পরিবারে মানসিক চাপ বেড়েছে। অর্থাৎ অনলাইন শিক্ষা শুধু শিক্ষার্থীদের নয়, শিক্ষক ও অভিভাবকদের ওপরও অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়েছে।

তবে এর কিছু ইতিবাচক দিকও অস্বীকার করা যায় না। প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বেড়েছে, সময় ও যাতায়াত খরচ কমেছে। দূরবর্তী এলাকার শিক্ষার্থীরাও কিছু ক্ষেত্রে ভালো শিক্ষকের ক্লাসে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই সুবিধাগুলো কি শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের ঘাটতি পূরণ করতে পারে? বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অনলাইন শিক্ষা এখনও পূর্ণাঙ্গ কাঠামো পায়নি। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, দ্রুতগতির ইন্টারনেট এবং সাশ্রয়ী ডিভাইস সবার নাগালে পৌঁছায়নি। তাই একে একমাত্র সমাধান হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বরং এটি হতে পারে সহায়ক বা সম্পূরক ব্যবস্থা। সরাসরি ক্লাসের সঙ্গে সীমিত অনলাইন কার্যক্রম মিলিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি গড়ে তোলা যেতে পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিশুর মানসিক ও মানবিক বিকাশ। মাঠে দৌড়ানো, বন্ধুর সঙ্গে হাসাহাসি, শিক্ষকের স্নেহময় উপস্থিতি এসবের বিকল্প ভার্সুয়াল জগতে নেই। শিক্ষা কেবল তথ্য অর্জন নয়; এটি জীবনবোধ শেখার প্রক্রিয়া।

পরিশেষে বলা যায়, অনলাইন শিক্ষা আমাদের সময়ের বাস্তবতা হলেও এর সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে সহায়ক হিসেবে, বিকল্প হিসেবে নয়। সচেতন পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়েই সম্ভব একটি ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ যেন শুধু স্ক্রিনে আটকে না থাকেÑ এই দায় আমাদের সবার।